Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 55
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 47 - 55
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্করের নির্বাচিত ছোটগল্পে বৈষ্ণবীয় প্রভাব

আবুল হোসেন আনসারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: abulhossan786@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Vaishnavism, Romance, love, Foreigner, Return, love affair, krishna devotion Vaishnava terms.

Abstract
The outlining of vaishnavism in Tarashankar Bandopadhyay's literary craftsmanship has occurred recurrently. It can be said, in his personal life he has never been away from vaishnavism. This tenacity is conspicuous in his authorship. The expression of vaishnavism is vivid in his novels ('Radha' 1959, 'Raikamal' 1935) to short stories. For example, 'Rasakali', 'Malachandan', 'Harano Sur', 'Prasadmala', 'Itimoddhe' etc. have witnessed the mark of the Brahmin influence. In this essay, mainly the aspects of Brahmin influence in short stories will be discussed. The short story 'Rasakali', is primarily written with the backdrop of the brahmin lifestyle. Therefore, various aspects of Brahmin society have been reflected in this masterpiece. The writer has shown his prowess in crafting a beautiful love affair to the use of music in it. Moreover, conflicts in characters, their behaviours and conversions, all these things are attached to the 'Vaishnav Padabali'. Even in 'Harano Sur', the ups and downs in the married life of Nonipal and Giri, the attraction of Giri towards Kodi, i.e., from Giri's flaw to his realisation have the Brahmin influence as the backdrop. To express the attitude of the characters, the writer has included quotations from Gyandas. Apart from that, in the short story 'Prasadmala', the inner conflicts of Gopal and the Lalita are inspired from vaishnavism. Furthermore, Gopal wished to get married to a brahmin girl Lalita by leaving his home at the village. The music of this short story is also 'Vaishnav padabali'. Along with these short stories, we can also get the influence of vaishnavism in 'Malachandan' and 'Itimoddhe'.

Discussion

বিশ শতকের তিরিশের দশকে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ও অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ভাবাকুল মনকে নিয়ে যায় গণদেবতার সৃজনভূমিতে। তারাশঙ্করের লেখনীতে একদিকে যেমন ঝরে পড়েছে উপন্যাসের সমারোহ, অন্যদিকে তিনি হাজির হয়েছেন ছোটগল্পের ডালি নিয়ে। তারাশঙ্করের সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠীরা তাঁদের রচনায় যে সমস্ত বিষয় তুলে ধরেছেন, তারাশঙ্কর সে পথে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 55
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না হেঁটে এক ব্যাতিক্রমী পদযাত্রার সূচনা করেছেন। তাই তাঁর রচনাশৈলিতে উঠে এসেছে মূলত নিম্নশ্রেণির মানুষের কথা, কৌম সম্প্রদায়ের কথা, উঠে এসেছে বীরভূম, বর্ধমান সংলগ্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার কথা। তাছাড়া, ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের রচনায় যেমন দেখা যায়, ব্যক্তি জীবনের উত্থান পতনের কাহিনি, তারাশঙ্করের লেখায় আঞ্চলিক জীবন জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে ধর্মপ্রাণ মানুষের কথা, আবার বিভূতিভূষণের লেখাতে খুঁজে পায় প্রকৃতিপ্রীতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার চিত্র। এদিক থেকেও তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। তারাশঙ্করের লেখনীতে সমাজতত্ত্বের কথা উঠে আসলেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। কারণ তাঁর ব্যক্তি জীবনেও বৈষ্ণব ধর্মের রেখাপাত ঘুরেফিরে এসেছে। বৈষ্ণব প্রভাব-মুক্ত তিনি কোনদিনও হতে পারেননি। কাননবিহারী গোস্বামী বলেছেন—

> "তারাশঙ্কর রাঢ়ের বৈষ্ণব সাধনার তাত্ত্বিক গভীরতায় তেমন প্রবেশ করেন নি। কিন্তু এখানকার আখড়াধারী গৃহী বৈষ্ণব, বাউল, বৈরাগী, কবিয়াল, কীর্তনিয়াদের জীবন প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাঁর রচনাবলীতে সুচিত্রিত হয়েছে। এদের বাস্তব জীবনচর্যাকে রাঢ়ের স্থানিক পটভূমিকায় হৃদয়ের মমত্ব দিয়ে তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন।"[১]

তাঁর উপন্যাস ('রাধা' ১৯৫৯, 'রাইকমল' ১৯৩৫) থেকে শুরু করে ছোটগল্পে পর্যন্ত উঠে এসেছে বৈষ্ণবীয় সুরের প্রাণময় প্রকাশ। যেমন – 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'প্রসাদমালা', 'সর্বনাশী-এলোকেশী', 'রাধারাণী', 'সাবিত্রি চুড়ি', 'বাঞ্ছাপূরণ', 'সখি ঠাকুরণ', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' - ইত্যাদি গল্পে বৈষ্ণবীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধে মূলত ছোটগল্পের দিকটা তুলে ধরা হবে। 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'প্রসাদমালা', 'রাধারাণী' — এই চারটি গল্পে বৈষ্ণবীয় প্রভাব কীভাবে উঠে এসেছে তা আলোকপাত করা হবে।

'রসকলি' গল্পটি ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি মূলত বৈরাগী জীবনের পটভূমিকায় লেখা হলেও গল্পের জীবন লেখকের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উৎসারিত। তারাশঙ্কর নিজেই সে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে —

> "দিন কয়েক পরেই এলাম একটি নিবিড় পল্লীগ্রামে। আমাদেরেই মহলে। যেখানে বাসা হল, তার সামনে একটি ছায়ানিবিড় আখড়া, রসিকজন রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ। বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী।"[২]

এই কমলিনীই 'রসকলি' গল্পে মঞ্জরীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অর্থাৎ 'রসকলি' গল্পের প্লট থেকে শুরু করে চরিত্র-চিত্রণ সমস্ত বিষয় বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে লেখক বৈষ্ণবীয় চেতনার সঙ্গে একটি ত্রিকোণ প্রেমের মাধুরী রচনা করেছেন। পাশাপাশি বৈষ্ণব সমাজের রূপ বৈচিত্র্যের একটা সার্থক নিদর্শন এই গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে।

সিরাজুল ইসলাম তাঁর 'তারাশঙ্করের 'রসকলি' দ্বন্দ্ব ও মীমাংসা' প্রবন্ধে বলেছেন —

> "সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতায় আকৃষ্ট কিন্তু এক আদর্শবাদী জীবনবোধ দ্বিধা তৈরী করলেও নিয়ন্ত্রিত পরিণত সমাজ-অনুগামী এবং আদর্শ মানবধর্ম-কল্পনায় রোম্যান্টিক। ফলে তারাশঙ্করের বৈষ্ণব-জীবন তত্ত্ববহির্ভূত, পঙ্কসমাজ-মুক্ত এক শৈল্পিক সন্দর্ভ। এখানে নীতির প্রশ্ন নয়, জীবনের বেদনা শান্তি ও সুস্থতায় যে পদক্ষেপ ফেলে তার গতি সন্ধানই মূল কথা।"[৩]

'রসকলি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল রামদাস, পুলিন, মঞ্জরী, গোপিনী, সৌরভী। গল্পের কাহিনি প্রথম থেকেই বৈষ্ণবীয় রসে সিক্ত। রামদাস শ্রীমতীকে নিয়ে সুখেই সংসার করছিলেন কিন্তু তার চেহারা বিশ্রী হওয়ায় কারণে শ্রীমতী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্রে পালিয়ে যায়। দুঃখে তীর্থভূমি বৃন্দাবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে ধোপার মেয়ে সৌরভী ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হলেও তাঁর মেয়ে মঞ্জরী একেবারে বৈষ্ণবের মতোই, যেন বৈষ্ণব আখড়ার কন্যা। মঞ্জরী পুলিনের বাল্যসঙ্গী, তারা প্রণয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ, গল্পের নায়ক-নায়িকা। সৌরভী রামদাসের নিকট তাঁদের বিয়ের কথা পাড়লে রামদাস বলেছেন –

> "রাধে রাধে তা যে হয়না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বষ্টোম, আর তোমরা ভেকধারী।"[৪]

আবার রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলে সেখানে শ্রীমতীর সাক্ষাৎ পেয়ে বলেছেন—

> "শ্রীমতী রাধারানী আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে বসে আছি।"[৫]

অর্থাৎ রামদাসের নিজেকে গোঁড়া বৈষ্ণব হিসেবে গড়ে তোলা, আবার শ্রীমতীকে রাধারূপে কল্পনার মধ্যে দিয়ে লেখকের বৈষ্ণবীয় সত্তার পরিচয় আমরা খুঁজে পাই।

'মঞ্জরী' চরিত্রটির মধ্যে বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের আভাস লক্ষ করা যায়। পুলিনের নিজস্ব স্ত্রী গোপিনী, তা সত্ত্বেও মঞ্জরী পুলিনকে ভুলতে পারেননি, তারা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। এমনকি পুলিন মঞ্জরীর বাড়িতে দিবা-রাত্রি সময় কাটালে মঞ্জরী বলেছেন —

"পাঁচসিকের বোষ্টমী তোমার
ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে।"[৬]

পরবর্তী পরিসরে সামাজিক প্রবঞ্চনার উর্ধ্বে উঠে সমস্ত অপমান উপেক্ষা করে পুলিনকে নিয়ে থাকতে চেয়েছেন। অর্থাৎ পুলিনের প্রেমে সে যেন বৈষ্ণব কবিদের রচনায় উঠে আসা কলঙ্কিনী রাধার মতো। মঞ্জরী নিজেই গোবিন্দ দাসের পদ গেয়ে নিজেকে রাধার আসনে বসিয়েছেন —

" 'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী'।

> পুলিন তার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্পর্শে তার সে কি উত্তাপ। মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্তমধুর কণ্ঠে কহিল ছাড়, ...তকতকে ঘরখানি, দেওয়ালে খান কয়েক পট সেই পুরোনো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল মিলন; সব গুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন।"[৭]

এই চিত্রপট দেখে আমাদের মনে সহজেই অনুভূত হয় তাদের ব্যক্তিগত জীবনবোধে উঠে আসা বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারার প্রকাশ। মঞ্জরীর জমিদারের নিকট ডাক পড়লে নিজের সম্পর্কে বলেছেন –

"আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমরা নতুন গাঁথি।"[৮]

আসলে এই উক্তির মধ্যদিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সমাজের একটি পরিবর্তিত রূপ আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

'রসকলি' গল্পের একমাস পর 'কল্লোলে' ১৩৩৫ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয় 'হারানো সুর' গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীর চরিত্র ননী, গিরি ও কড়ি। এখানে একদিকে দাম্পত্য জীবনের কলহ, ঘাত-প্রতিঘাত, রোমান্সধর্মের প্রাবল্য যেমন উঠে এসেছে, অন্যদিকে পরকীয়া প্রেমের লেলিহান আকর্ষণ দেখানো হয়েছে। কথা সাহিত্যিক ননীর জীবনে হারানো সুরের প্রত্যাবর্তন ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে গিরির প্রত্যাবর্তনটাও গল্পে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে অর্থাৎ গল্পের আদি-অন্ত জুড়ে কবি মানসে উঠে এসেছে বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার প্রকাশ।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, ননীর দৈনন্দিন কার্যকলাপ, আচার-আচরণে বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্ট। ননী অসাধারণ প্রতিভাশালী বাউলের একতারা, সাঁওতালদের বাঁশী তৈরী করতে পারেন। এমনকি নিজেও বাঁশিতে সুর তুলতে পারেন। তাই কড়ির মতো লোক তাঁকে 'ওস্তাদ' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু ননীর জীবনে জোয়ার ভাটা নেমে আসে গিরির আগমনের পরেই। তাঁর সাধনার একতারা খসে পড়ে, অধরের বাঁশী নেমে যায়। ননীর সাধনার বাঁশীকে গিরি জ্বালানিরূপে ব্যবহার করতে চাইলে একদিকে যেমন ননীর শিল্পী সত্তার মৃত্যু ঘটেছে, আবার অন্যদিকে তাদের মধ্যে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। ননীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিরি স্বামীর কাছে গান শুনতে চায়। তাই গিরির অভিমান ভরা আবেদনকে অবহেলা না করে বিষন্ন মনে ননী গান ধরলেন —

"শ্যাম আবার কেন বাঁশী খোঁজে
বাঁশী যে ডুবেছে জলে"[৯]

ননীর এই গানের মধ্যে উঠে এসেছে বৈষ্ণবীয় ভক্তি রসের আমেজ, যেখানে তার অভিমানী চিত্তের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। শ্যাম যে বাঁশী ছাড়া অপারগ; প্রেমের আবেদন এই বংশীধ্বনি দ্বারাই মুখরিত হয়, সেই বাঁশী আজ নেই।

গল্পে দেখা যায়, ননীদের গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় বাবুদের বাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন ও যাত্রাগানের আসর বসেছে। ননীর মধ্যে সেখানে যোগ দেওয়ার কোন প্রকার বাসনা দেখা না গেলেও গিরির মধ্যে সে বাসনা প্রবলতর হয়ে ওঠে। যাত্রাগানের আসরে সে নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছে। হরিনাম সংকীর্তনের সুরধ্বনি গিরির শ্রবনে এলে তার মনে-প্রাণে প্রশান্তির আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি তার রুক্ষ, শুষ্ক অবহেলিত জীবনে প্রেমের সঞ্চার দেখা যায়। লেখক বলেছেন—

"হরিনামে শুনে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে।"[১০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 55
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুধু তাই নয়, কথা সাহিত্যিক যাত্রাগানে কিশোর কিশোরীর যে প্রেমের চিত্র দেখিয়েছেন সেখানে বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের নিম্নলিখিত পদটি তুলে ধরেছেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"[১১]

এই গানে প্রেমতন্ময়ী রাধার যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়, গিরির মনের অবস্থাও সেই রূপ। তাই মহোৎসব থেকে বাড়িতে ফিরেই গিরি ননীকে বলেছেন —

"কি সুন্দর কেষ্ট গো, যেমন চেহারা, তেমনি গান।"[১২]

অর্থাৎ গিরির সংলাপে কেষ্টর প্রতি তাঁর অবারিত আকর্ষণ স্পষ্টরূপে উঠে এসেছে। আবার কড়ি ননীকে দেখে গান ধরলে সেটিও বৈষ্ণব প্রভাব আশ্রিত—

"বাঁশী ছেড়ে অসি ধরা সে কি ব্রজধামে চলে
কিরূপ কি হল হরি, দেখ হে যমুনার জলে।"[১৩]

অবশেষে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হয়ে, ননীর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেই গিরি কড়ির বুকে নিজেকে আত্মসমর্পন করেছেন। বৈষ্ণব মতে যে কৃষ্ণকথা রয়েছে, সেখানে কৃষ্ণ মূলত প্রেমিক কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শোনার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতেন এবং বংশী ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই ধাবিত হতেন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। গিরির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। অবশেষে বিরহ-কাতরা গিরি, ননীকে ফেলে মায়ের সঙ্গে ব্রজধামে যেতে চেয়েছেন। গিরি একান্তই রাধাভাবে ভাবিত তাই শ্যামের বাঁশী শুনবে বলে ব্রজধামে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। লেখক সাধারণত বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই গিরির উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"বড় আশায় সে বুক বাঁধিয়াছে-ব্রজের বাঁশী শুনিবে, সে শান্তি পাইবে, আঃ সে চির-পবিত্র চির আনন্দময়।"[১৪]

অন্যদিকে নিরুপায় ননীর অশ্রুভারাক্রান্ত মনের অবস্থাকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক জ্ঞানদাসের পদ তুলে ধরেছেন —

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"[১৫]

অবশেষে কড়ির ফেলে যাওয়া বাঁশী দিয়ে ননী সুর তুললে, গিরি সেখানেই বৃন্দাবন খুঁজে পেয়েছেন —

"এই তো আমার তীর্থ মধুর, মধুর বংশী বাজে, এই তো বৃন্দাবন।"[১৬]

'প্রসাদমালা' গল্পটি প্রকাশিত হয়, ফাল্গুন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। গল্পের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে, ভক্তিভাবের প্রাধান্য। তাছাড়া, গল্পের নায়ক গোপাল ও নায়িকা ললিতা নামের মধ্যেও রয়েছে বৈষ্ণবীয় মহিমা। গল্পটি মূলত গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

"গ্রাম্য জীবনের সংস্কার রক্ষিত জীবনযাত্রার মধ্যে যে সম্পর্কের উন্মেষ, নতুন যুগের অর্থগৃঢ়তা, আত্মীয়তার মর্যাদানাশী, সর্বগ্রাসী লোভ ও নারীর হঠাৎ ঈর্ষা ও সন্দেহের জন্য উন্মুলন।"[১৭]

গল্পের চরিত্র গুলি যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তাঁদের জীবন যুদ্ধের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়েও বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পাওয়া যায়, আবার একই সঙ্গে মানবপ্রেমের ক্ষয়িষ্ণু চেহারার প্রতিফলন, সেখান থেকে ঈশ্বর প্রেমে উত্তরণ, শেষে মানবপ্রেমকেই প্রতিষ্ঠাদানের মধ্যদিয়ে লেখক বৈষ্ণবীয় চেতনাকেই গ্রহণ করেছেন।

গল্পের সূচনাতেই হরিমোড়লকে দেখা যায় জলভরা জমিতে গান গাইতে গাইতে লাঙ্গল দিচ্ছেন। গোপালচন্দ্রের হেফাজতের গরুগুলি ধানের ক্ষেতে হানা দিলে হরিচরণ গোপালের উদ্দেশ্যে বলেছেন —

"শ্রীমান কোথাও উধাও; ধেনুচারণ ত ছাড়িয়াছেই - গোপাল বেণুও বাজায় না যে শব্দভেদী গালি নিক্ষেপে হতভাগা কে ফিরাইয়া আনা যায়।"[১৮]

এই সংলাপে যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব রয়েছে তা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। বিশেষত গোপালের গোষ্ঠযাত্রার চিত্রটি আমাদের স্মরণে আসে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্য বিষয়ক পদ রচয়িতা যাদবেন্দ্র দাসের গোষ্ঠ যাত্রার পদে দেখা যায় শিশু গোপাল গোচারণে গেছেন, এদিকে সন্তানের চিন্তায় মায়ের মন উৎকণ্ঠিত তাই গোপালকে বেণু বাজাতে বলেছেন। তাহলে যশোদা বুঝতে পারবেন গোপাল নিকটে রয়েছেন। যাদবেন্দ্র দাস লিখেছেন—

"নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু

ঘরে বসে আমি যেন শুনি”[১৯]

হরিমোড়ল অর্থলোভী। তার চরিত্রে রয়েছে প্রধানত দুটি দিক। প্রথমটি, সম্পত্তির লোভ অপরটি দেহের প্রতি লালসা। তাই বিধবা চিত্তকালীর মেয়ে ললিতাকে ছেলে গোপালের সঙ্গে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দুটি উদ্দেশ্যেই সফল হতে চেয়েছেন। চিত্তকালী স্বামীহীনা, এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন হরিমোড়ল। তাই চিত্তের বাড়িতে প্রায় তাকে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। ব্যাপারটা জানাজানি হলে, দুই সইয়ের মধ্যে তুমুল ঝামেলা বাঁধে। চিত্তকালীর কথাতেই তা স্পষ্ট রূপে উঠে এসেছে—

“আমি কিসের কাঙ্গালিনী আমি বৃন্দাবনের পরান ধন কানুর জননী।”[২০]

অর্থাৎ চিত্তকালীর নিজেকে আশ্বস্ব করার জায়গাটিও বৈষ্ণব মনোভাবাপন্ন।

তাছাড়া হঠাৎ গোপালের বাড়ি থেকে পলায়ন, কীর্তনীয়া প্রেমসুন্দরের কীর্তনদলে তার আশ্রয় গ্রহণ। পরিবার থাকা সত্ত্বেও অনাথ বলে নিজের পরিচয় প্রদান, এই সমস্ত ক্ষেত্রে গল্পের কাহিনি আরো বেশি তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে। গোপাল ক্রমশ বৈষ্ণবদের প্রেমভাবে মোহিত হয়ে গানে তালিম দিতে শুরু করেন। দলে থেকে গানও শিখে নিয়েছেন। আসলে গোপালের এই গৃহত্যাগ, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চৈতন্যদেবের শচী গৃহ ত্যাগের পর সন্ন্যাস গ্রহণের ছবিটি। অন্যদিকে গোপালের সন্ধান না পেলে, সন্তান লুকিয়ে রাখার অপবাদ চাপিয়েছে চিত্তকালীর উপরে। শেষপর্যন্ত চিত্তকালী, কাত্যায়নী ও মোড়লের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

> “শ্রাবণের বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি পিচ্ছিল পথ বিদ্যুতের ঘন লেলিহান প্রকাশ গদ্যের গর্জন তারই মধ্যে স্থান মান হারাইয়া নিঃসম্বল বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া, গোবিন্দ কোথায় যাত্রা করল।”[২১]

এ যাত্রা নেহাতেই কোন সাধারণ যাত্রা নয়, বৈষ্ণব কবিদের রচনায় উঠে আসা অভিসারিকা রাধার কৃষ্ণের নিকট গমনকালে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্করও সেই পথেই হেঁটেছেন। অর্থাৎ কুল, মান সবকিছুকে উপেক্ষা করে দয়িত কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধার যাত্রা, চিত্তকালীও ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে সেই পথে পাড়ি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে লেখকের বৈষ্ণব চেতনায় গল্পের মূল চালিকাশক্তি।

গোপালের সন্ধান পাওয়া গেলে প্রেমসুন্দর হরিমোড়লের সঙ্গে দেখা করেন এবং হরিচরণকে বলা বক্তব্যের মধ্যেও বৈষ্ণব প্রভাবের ছায়াপাত লক্ষ করা যায় —

“তোমার সন্তান নিয়ে যাও ভাই। নিয়ে যাবে বৈকি গোপাল নইলে আঙ্গিনা মানাবে কেন।”[২২]

অর্থাৎ কৃষ্ণের শৈশবলীলাকে লেখক এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্মরণ করতে চেয়েছেন।

গোপালের বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যত্রে পাত্রী দেখার আয়োজন শুরু হয়। বিড়ম্বনার শেষ নেই কারণ, মা চায় রূপ, বাপ চায় রৌপ্য। এই দু’য়ের মিল হয়নি, তাই গোপালের বিয়েও হয়নি। এমন সময় গোপাল দ্বিতীয়বার পাড়ি দেয় কীর্তন দলের সঙ্গে। প্রেমদাস বাবাজী গোপালকে তার অন্তরের প্রেমভক্তি দিয়ে ব্রজের কথা, ব্রজের গাথা, ব্রজের কাহিনী শেখান। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় বৈষ্ণবীয় ভাবধারার জারিত রসে তাঁর মন-প্রাণ এতদিনে ভিজে উঠেছে। তাই গোপালের হৃদয়বিদারক চিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার গানের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের একটি পদ তিনি তুলে ধরেছেন —

“এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।”[২৩]

আবার কাত্যায়নীর মৃত্যুর পর হরিমোড়লকে চাষ, জমা ছেড়ে বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, সুদ-সম্পত্তি নিলাম ছেড়ে তুলসীর মালা হাতে পরম বৈষ্ণব হয়েছেন। সর্বস্ব ছেড়ে কৃষ্ণভক্তিতে মনোনিবেশ করেন গোপালের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাই পিতার মনের অবস্থাকে গোপাল গানের কথায় প্রকাশ করেছেন—

“সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু

অনলে পুড়িয়া গেল।”[২৪]

আলোচ্য পদে জ্ঞানদাসের কবি ধর্মের মানবিক বাঞ্ছার সঙ্গে হরিমোড়লের মানসিক অবস্থার কথা স্মরণ করা যায়। অবশেষে, মোড়ল মারা যাওয়ার সময় পুত্র গোপালের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, গোবিন্দের নাম পর্যন্ত করেননি, তবে কাত্যায়নীকে বারবার স্মরণ করেছেন অর্থাৎ ‘ধর্মের চেয়ে প্রেম বড়’ এ বাণীই আমাদের নিকট বলতে চেয়েছেন। আসলে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন প্রেমধর্মে বিশ্বাসী, তাই তিনি প্রেমধর্মকে জনমানসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শেষ 'জীবনে হড়িমোড়লের মানসপটে এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আভাস প্রত্যক্ষ করা যায়।

পিতাকে হারিয়ে গোপাল বেরিয়ে পড়েন ললিতার সন্ধানে। প্রথমে ললিতার মামার বাড়ি, পরে চিত্তকালীর চিঠি পেয়ে গোপাল কলকাতায় যাত্রা করেন। চিত্তকালী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তার কথা মতো ললিতাকে গোপাল নিজের আলয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু ললিতার বিলাসী মন বৈরাগী গোপালের কাছে টিকেনি। তাই সে গোপালের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্রে চলে যায়। ললিতার বিরহে গোপাল বিরহের গান ধরেন। এখন সে সুন্দরীর উপাসনা ছেড়ে, সুন্দর অর্থাৎ শ্যামের উপাসনায় মন দিয়েছেন। লেখক বলেছেন –

> “দুদিন গেল, দশ দিন গেল, মাস বৎসর চলিয়া গেল, গোপাল কিন্তু গোপালেই রহিয়া গেল, নারীর সহিত আর সে সম্বন্ধ পাতাইল না। সুন্দরের উপাসনায় সে মজিয়া গেল।”[২৫]

শেষ অংশে লেখক গল্পের কাহিনিকে নিয়ে গেছেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি, আলোচ্য গল্পে সকল কীর্ত্তনীয়া এসেছেন নবদ্বীপে পূজো দিতে, পালাগান করতে। সেখানে হাজির হয়েছেন গোপালও তাঁর দলবল নিয়ে। আসরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> “সন্ধ্যার মুখে বিরহের গান চলিতেছিল, শতবর্ষব্যাপী বিরহ; নন্দপুর চন্দ্র বিনা অন্ধকার...তরুলতায় আর ফুল ফোটে না, কদম্বতরু পত্রহীন, যমুনার জল কল্লোলে ক্রন্দনে সুর, অভিমানিনী রাধার আর অভিমান নাই। শীর্ণতনু, প্রাণ আর থাকে না। তবু চিন্তা — ‘কানু হেন গুণনিধি কার দিয়ে যাবো’ শ্যামকে যে তার মত ভালোবাসিতে আর কেহ নাই।”[২৬]

আসলে এখানে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রকাশেই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনায় উঠে আসা বিরহ মিলনের সুরটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে গোপাল ও ললিতার মধ্যে। তাই গোপালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

> “না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাষায়ো জলে
> মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে।”[২৭]

তারাশঙ্কর নবদ্বীপের রূপ বর্ণনায় মধ্যে দিয়ে গোপাল ও ললিতাকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। কাহিনি অনেকটা ফল্গু ধারার মতো, উপরে নায়িকাকে নায়কের প্রসাদী মালা দান, অন্তরে বৈষ্ণবীয় চেতনার প্রগাঢ় রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই গোপাল ললিতাকে পেয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর সুরেই গেয়েছেন—

> “বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
> দেখা তো হত না পরাণ গেলে।”[২৮]

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে তারাশঙ্কর পদকর্তা চণ্ডীদাসেরদাসের ‘এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা’ পদটির একটি বিপরীত প্রতিমূর্তি অঙ্কন করেছেন এখানে।

‘রাধারাণী’ গল্পটি মূলত বৈষ্ণবীয় জীবনধারায় প্রবাহিত ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট দ্বারা নির্মিত। গল্পটি প্রথমে শারদীয়া ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রেমের অবিনশ্বর মূর্তিকে স্থাপন করতে গিয়েই লেখক মানবিক সত্তাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এখানে। তাছাড়া, বহির্মুখী দুঃখ-কষ্ট ভুলে গল্পে অন্তর্মুখী জীবনযাত্রার মর্মভেদী চিত্রকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্পে প্রেমের প্রকাশ থাকলেও তার অসীম রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ গল্পের মূল প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে লেখক মূলত বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার পথ ধরেই বিচরণ করেছেন।

গল্পের সূচনায় একটি কৃষ্ণযাত্রার দলের আগমন ঘটেছে একটি পল্লী অঞ্চলে। দলটি খুব বড় নয়, লোকের সংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশ। দলের ম্যানেজার রক্তচক্ষু এক প্রৌঢ়। তিনি পশুপতি নামক দলের এক ব্যক্তিকে দোকান থেকে খাদ্যের সামগ্রী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 55
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনতে বলেছেন। তবে দলের মূল গায়েন গৌরদাস হলেন দলের অধিকারী, তিনিই যাত্রাগানের অধিনায়কত্ব করে থাকেন। তার পরিচয় প্রদানে লেখক জানিয়েছে —

> "রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সেই হয় বৃন্দা দূতী, নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সেই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী, কখনও সখি, কখনও রানী - একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ অভিনয় করিয়া যায়।"[২৯]

'রাধারাণী' গল্পে যে প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তা মূলত গৌরদাসের জীবনে ঘটে যাওয়া বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের স্মৃতিচারণ। তার মনোলোকে যে স্মৃতিপট উদ্ভাসিত হয়েছে সেখানে প্রথম থেকেই বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

> "ছোট দশ বৎসরের কমনীয় কান্তি একটি ছেলে ...সন্ধ্যায় গান শিখিত - অধিকারী পাখির মত তাহাকে শিখাইতেন। বৃন্দা প্রশ্ন করিত – বলিত হ্যাঁগো শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী ব্রজের রানী তুমি তোমার চোখে কেন জল গো? উত্তর দিত - বৃন্দে গো পিরিতীর রীতি এমন কেন বলতে পার সখি।"[৩০]

আসলে গৌরদাসের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত কাহিনি এই গ্রামেরেই, বোষ্টম পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠা রাধারাণী ও গায়েন গৌরদাসের প্রেমের কাহিনি। গৌর রাধার ভূমিকায় অভিনয় করলে তাঁর খ্যাতি গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রার পরের দিন বালিকা রাধা এসে পল্লী গ্রামে গলির বাঁকা পথ দিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। রাধার মা বলেছেন —

> "এস এস গোপাল এস। তোমার জন্য আমি বসে আছি। মেয়েটি ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল দূর। গোপাল কেন হবে? – ও যে শ্রীমতী রাধে।"[৩১]

গৌরদাস জানিয়েছে সে জাতিতে বোষ্টম। রাধার মা বিশ্বাস করেন বোষ্টম না হলে এমন সুন্দর রাধার ভূমিকায় অভিনয় হওয়া সম্ভব নয়। তাদের অনুরোধে গৌর গানও শুনিয়েছেন—

> "শ্যামশুকপাখী সুন্দর নিরখি ধরিলাম নয়ন-ফাঁদে।"[৩২]

তাছাড়া পরিহাসছলে রাধারাণীর বক্তব্যে আমরা গৌরদাসের প্রতি তার প্রেমের সুপ্ত বাসনা প্রত্যক্ষ করি –

> "না-না-সখি-সে মুখ আর আমি দেখাব না গো। কালো রূপ আর হেরব না। যমুনার জলে কালো-যমুনায় আর যাব না গো। মাথার কেশ কালো – সে কেশ আর রাখব না সখি! নীলাম্বরের বর্ণ কালো, লীলাম্বরী আর পরব না গো ! দাও দাও আমাকে গৈরিক বাস এনে দাও সখি, আমায় যোগিনী সাজায়ে দাও।"[৩৩]

আসলে রাধারাণীর এই সংলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় চন্ডীদাসের রাধার কথা। অর্থাৎ চন্ডীদাসের রাধার ভাবমূর্তির প্রকাশ ঘটেছে রাধারাণীর মধ্যে।

গল্পের কাহিনিতে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, তৎকালীন সমাজে বিশেষত পল্লী অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটি বাস্তব চিত্র। রাধুর মায়ের কথাতেও বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধর্মের প্রতি আস্থা ছিল বলেই, বিধর্মী ছেলের হাতে মেয়েকে বিয়ে দিতে সাহস পাননি। তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন জমিদার বংসের সন্তান, জমির তদারকিতে লেখককে প্রায় যেতে হত সেই সমস্ত পল্লী অঞ্চল গুলিতে। গ্রাম পরিদর্শনকালে যা প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর লেখার মধ্যে সেগুলি উঠে এসেছে।

তাছাড়া, রাধারাণীর পিতা যাত্রাদলের ম্যানেজার ঘোষালের নিকট জানতে পারেন গৌর তার নিজের সন্তান নয়। গৌরকে ছোট বেলায় কুড়িয়ে পেয়েছেন, তার মা ছিলেন বারাঙ্গনা, জাতিতেও ভিন্ন। ঘোষালের বক্তব্যের মধ্যে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে –

> "ভাল করে একটু অধিকার হলেই – আমি ওকে বৈষ্ণব করে দেব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতি কুলের বিচার বড় নয় – সে বাধায় নাই।"[৩৪]

এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর নিজেই তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন –

> "চৈতন্যদেব যে নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর মূল কথাই ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে প্রেমভক্তি বিতরণ। মহাপ্রভুর এই উদার প্রেম-ধর্মই গ্রাম বাংলার জনজীবনে বিশেষত নিম্নশ্রেনীর মানুষকে আলোড়িত করেছিল।"[৩৫]

গৌরদাস সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর যাত্রার দলে তার আর মন বসেনি। দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। গৌর এখন নিজেই দল গড়েছেন, পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার সেই গ্রামেই এসেছেন কৃষ্ণযাত্রা করতে। কিন্তু তার মনপ্রাণ জুড়ে

এখনো রয়েছে রাধারাণী। তাই রাধারাণী দর্শনে পল্লীর গলিপথ দিয়ে দ্বিতীয়বার হেঁটেছেন কিন্তু বেদনার্ত মন নিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। কারণ রাধু এখন অন্যের ঘরণী, তাই গৌরদাসকে চিনিয়াও চিনতে পারেননি। গল্পকার এখানে বৈষ্ণবীয় প্রেম তত্ত্বকেই সামনে রেখে বলেছেন –

> "সম্মুখে শূন্যপথ; পিছনে রাধুর স্মৃতি-বিজড়িত ওই আখড়ায় ভগ্নস্তূপ – ওই গলিটা গভীর আকর্ষণ করিতেছিল, বুকে অসহ্য দুঃখ – রাধু নাই! ... মূলগায়েন রাধা ছেলাটিকে সম্মুখে আনিয়া বলিল – রাধে, তুমি আগে চল। রাধারাণী! রাধু না থাক রাধারাণী আছে!"[৩৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখিত চারটি গল্পের মধ্যেই কমবেশি বৈষ্ণবীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি গল্পে বৈষ্ণবের স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা থেকে শুরু করে সঙ্গীত ব্যবহারের নিপুণ প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষ করে জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির কয়েকটি বৈষ্ণব পদের ব্যবহারের ফলে গল্পগুলির শিল্পরস ও বিষয়গত তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান চরিত্র গুলোর হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আচরণ, বার্তালাপ সমস্তই বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা। বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া প্রেমের যে চিত্র পাওয়া যায় সেখানে লোকনিন্দাকে উপেক্ষা করে রাধার প্রেম সার্থক হয়েছে। 'রসকলি' ও 'হারানো সুর' গল্পে যে পরকীয়া প্রেমের চিত্র আমরা পেয়েছি তা বৈষ্ণব প্রভাব আশ্রিত। 'রসকলি' গল্পের মঞ্জরী লোকনিন্দাকে উপেক্ষা করেই পুলিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। আবার 'হারানো সুর' গল্পে গিরির মধ্যে লোকভয় থাকা সত্ত্বেও কড়ির বুকে নির্ভয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তারাশঙ্কর কোথাও না কোথাও পরকীয়া প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েও দিতে পারেননি। তাই মঞ্জরীকে শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন। গিরিকেও বৃন্দাবনে পাঠানোর কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু স্বামীর কাছে তাকে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। আবার 'প্রসাদমালা' 'রাধারাণী' গল্পের মধ্যেও প্রেমের টানাপোড়েন চোখে পড়ে। লেখক বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের আধারে গল্প দুটিতে প্রেম চেতনার দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বে বলা হয়েছে যে, প্রেমের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথরেখা নির্মাণ হয়। 'প্রসাদমালা' গল্পের গোপাল তাই ললিতাকে ভুলে কৃষ্ণ সেবায় দিন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিরহের গান নিয়ে থেকেছেন। অর্থাৎ সুন্দরীকে ভুলে সুন্দরের উপাসনা করেছেন। 'রাধারাণী' গল্পে গৌরদাস বাল্যপ্রেমিকা রাধুকে পঁয়ত্রিশ বছর পরেও পাননি, তাই আক্ষেপের সুরেই বলেছেন রাধু না থাক! রাধারাণী আছে। এ ভাবেই সগুনে বাংলা সাহিত্য সময় গণ্ডি অতিক্রম করে বৈষ্ণবীয় প্রভাব চিরন্তন হয়ে রয়ে গেছে। বৈষ্ণবীয় প্রভাবে প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্য পাঠক মনে আজো নতুন নতুন ভাবনাচিন্তার উদগিরণ হয়ে চলেছে।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, পল্লব, (সম্পাদিত) তারাশঙ্করঃ আলোকিত দিগ্বলয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ২২শে শ্রাবণ, ১৪০৭ পৃ. ৭৫
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, ২০ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১৮
৩. চৌধুরী, ভীষ্মদেব, (সম্পাদিত) তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ, নবযুগ প্রকাশনী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০১, পৃ. ১৭৭
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, রসকলি, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ. ১৭২
৫. তদেব, পৃ. ১৭৫
৬. তদেব, পৃ. ১৭৮
৭. তদেব, পৃ. ১৮৪-১৮৫
৮. তদেব, পৃ. ১৯২
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হারানো সুর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, পৃ. ৮
১০. তদেব, পৃ. ১০
১১. তদেব, পৃ. ১১

১২. তদেব, পৃ. ১২
১৩. তদেব, পৃ. ১৪
১৪. তদেব, পৃ. ১৪
১৫. তদেব, পৃ. ২২
১৬. তদেব, পৃ. ২৪
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পৃ. ৫৩৯
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, প্রসাদমালা, এম,সি,সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৩৫২, পৃ. ১
১৯. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৬১, পৃ. ৯৭৩
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, প্রসাদমালা, এম,সি,সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৩৫২, পৃ. ১২
২১. তদেব, পৃ. ২২
২২. তদেব, পৃ. ২৩
২৩. তদেব, পৃ. ২৫
২৪. তদেব, পৃ. ২৭
২৫. তদেব, পৃ. ৫০
২৬. তদেব, পৃ. ৫৩
২৭. তদেব, পৃ. ৫৩
২৮. তদেব, পৃ. ৫৫
২৯. বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ পৃ. ৪০৩
৩০. তদেব, পৃ. ৪০৮
৩১. তদেব, পৃ. ৪০৯
৩২. তদেব, পৃ. ৪০৯
৩৩. তদেব, পৃ. ৪১০
৩৪. তদেব, পৃ. ৪১২
৩৫. তদেব, পৃ. ৪১৩
৩৬. তদেব, পৃ. ৪১৫